ভোট-কথা

ক্রান্তিকারী নওজোয়ান সভা-র বিশেষ বুলেটিন

গণতন্ত্রের সবচেয়ে বড় উৎসব নাকি 'ভোট'। আবার একটা ভোট এসে গেছে। পৌর নির্বাচন। চেনা লোকের নাম দেওয়ালে দেওয়ালে। চেনা চেনা সব চিহ্ন। 'চেনা প্রতিশ্রুতি'র বন্যার ফাঁকে নতুন নতুন গিমিক; রাজনৈতিক কাদা ছোঁড়াছুঁড়ি, থুরি বিতর্ক। সারা বছর যারা রাজনীতির ছায়া মাড়ায় না তাদের মুখেও একই আলোচনা। ফলে আমরাই বা বাদ যাই কেন? 'গনতান্ত্রিক দেশে' খোলাখুলি মত প্রকাশে আমরাও নেমে পড়লাম। কোনও বিশেষ দল বা বিশেষ প্রার্থীকে ভোট দিতে বলা বা না দিতে বলার বাইরে কিছু রাজনৈতিক কথাবার্তা বলতে চেষ্টা করব আমরা।

- পৌর নির্বাচন বনাম লোকসভা-বিধানসভা নির্বাচন
- ভোটদান বনাম সংসদীয় গণতন্ত্র
- সুযোগ-সুবিধে আর ভোটের মধ্যে দেনাপাওনার সম্পর্ক
- সাধারণ মানুষকে টুপি
- ভোটের খরচ যোগায় সমাজের পয়সাওয়ালা শ্রেণীর মানুষ
- মেয়েদের ক্ষমতায়ণের প্রশ্নটা
- বারবার পরিবর্তন গণতন্ত্রের পক্ষে ভাল?
- পাইয়ে দেওয়ার রাজনীতি
- কিন্তু গণতান্ত্রিক 'দেশ' যে অর্থে তাতে দাঁড়ায় দেশ কীভাবে চলবে সে ব্যাপারে রাষ্ট্র সবার মতামত নেবে।
- শত্রুর শত্রু আমার বন্ধু
- শুধু ভোটবাক্সে নয়, সারা বছর রাজনৈতিকভাবে সক্রিয় থাকুন।
- দুয়ার রুদ্ধ পৌর-ভবনে
- নীতি বিবর্জিত অশুভ জোট
  অথবা
  এ কেমন ভালবাসা কে জানে?
- মানুষ ভোট দেবে আমরা সর্বতভাবে তার পক্ষে।
  কিন্তু আমাদের মতামত নিচ্ছেটা কোথায়?

চিত্রণঃ-সৌম্য দাস ও ইন্টারনেট থেকে সংগৃহীত

আমাদের ফেসবুক পেজ
https://www.facebook.com/KNS2013?ref=hl

যোগাযোগ
৯৫৬৩৮৫০৩৮২
৯৮০৪৫৬১৮৭৫
৯৮৫১৯৪৪৫৫৯

আপনাদের মতামতের অপেক্ষায় রইলাম

কীভাবে চলে আমাদের দেশ?

স্বয়ং ভারতরাষ্ট্র, দরবারী রাজনৈতিক দলগুলো, এনজিও, কর্পোরেট পরিচালিত মিডিয়া, সর্বোপরি আমাদের গুরুজনেরা আমাদের একটা বদ্ধমূল ধারণা তৈরি করিয়ে দেয় যে 'আমাদের নির্বাচিত প্রতিনিধিরা দেশ চালায়, পরোক্ষে আমরাই আমাদের দেশ চালাই'। 'কোনও সরকার ভুলভাল পদক্ষেপ নিলে জনতার সম্মিলিত শক্তি সে সরকারকে উল্টে দিতে পারে'—ইত্যাদি, ইত্যাদি।

রাষ্ট্র কেবলমাত্র গণতান্ত্রিক সংসদীয় ব্যবস্থা দিয়ে চলে না, বরং এই বিরাট রাষ্ট্র কাঠামোকে ধরে রেখেছে বেশ কয়েকটি স্তম্ভ। আমলাতন্ত্র, আইনসভা-বিচারসভা, পুলিশ-মিলিটারি, এমনকি আধুনিক রাষ্ট্রে মিডিয়াকেও গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ বলা হয়; বলা ভাল রাষ্ট্র পরিচালনায় গণতান্ত্রিক কাঠামোর ভূমিকা সবচেয়ে কম। প্রায় সমস্ত পলিসি নির্মাণ আর বাস্তবায়ন করে আমলাতন্ত্র। অথচ তারা কী পলিসি নেবে বা কীভাবে বাস্তবায়ন করবে সে নিয়ে আমজনতার মতামত দেওয়ার অধিকার দূরে থাক সংসদীয় কাঠামোর মতো কারা সেই পলিসি নেবে তাকে বেছে নেওয়ার ক্ষমতাও আমার-আপনার হাতে নেই।

তাহলে গণতন্ত্রের রক্ষীরা কী করে?

তাদের ভূমিকাটা এই পলিসিগুলো বাস্তবায়ন করতে গেলে জনগনের বড়সড় প্রতিরোধ হতে পারে কিনা বা একটা-দুটো জিনিস যা জনগণ চাইছে তা নিয়ে পলিসি তৈরি করার জন্য বলা(না হলে জনগণ বিক্ষুব্ধ হবে), কোনও একটা কাজ আমুক জায়গায় না হলে তমুক জায়গায় হবে, এবছর হবে না পরের বছর হবে—এরকমই দু-চারটে ছোটখাটো জায়গায় সীমাবদ্ধ।

ফলে এখানে আমলাতন্ত্র আর গণতান্ত্রিক সরকার একটা অশুভ আঁতাতের মধ্যে দিয়ে চলে। তার মধ্যে আবার গণতান্ত্রিক সরকারের ভুমিকা কম। ধরুন কোথাও কোনও সরকার পড়ে গেল—সত্যি কি তাতে জনজীবনে তার কোনও প্রভাব পরে নাকি? দিব্যি একই রকম ভাবে শোষণ চলে। দীর্ঘদিন ধরে প্রচুর এমএলএ-এমপিরা অধিবেশনে যায় না, গেলেও কথা বলে না, ঘুমোয়। আর উল্টোদিকে দেখুন—আমলারা দেশ জুড়ে দুদিন কাজ করা বন্ধ করে দিক—হাহাকার পড়ে যাবে—কিছু চলবে না।

শাসনবিভাগ-বিচারবিভাগ আছে নানান অংশের মানুষের, নানান শ্রেণীর মানুষের স্বার্থের যে দ্বন্দ্ব সেগুলোকে ক্রমাগত আপোষে নিষ্পত্তি করার চেষ্টা চালিয়ে যাওয়া আর বকলমে এই ব্যবস্থাটা(র যে স্থিতিশীলতা তার অস্তিত্বটা) রক্ষা করে যাওয়ার জন্য। কখনো মিডিয়া মারফৎ লাগাতার প্রচার চালিয়ে সেই অস্তিত্বের মান্যতা আদায় করা (যাকে বলে হেজিমনি) আর তাতে সম্ভব না হলে পুলিশ-মিলিটারি দিয়ে উৎপীড়ন।

রাষ্ট্রকাঠামো যখন স্থিতিশীল ভাবে চলে তখন বুঝতে হবে এই পাঁচটা স্তম্ভের মধ্যে কোনও আপাত বিরোধ নেই। দিব্যি পারস্পরিক পিঠ চাপড়ে টিকে আছে। কোনও একপক্ষ বেঁকে বসলে কিন্তু দিব্যি টের পাওয়া যায়। মাথায় রাখতে হবে রঙ্গশালায় এরা সবাই কিন্তু কাঠের পুতুল-সুতো বাঁধা আছে অন্য জায়গায়, সে আলোচনা অন্যত্র করা যাবে।

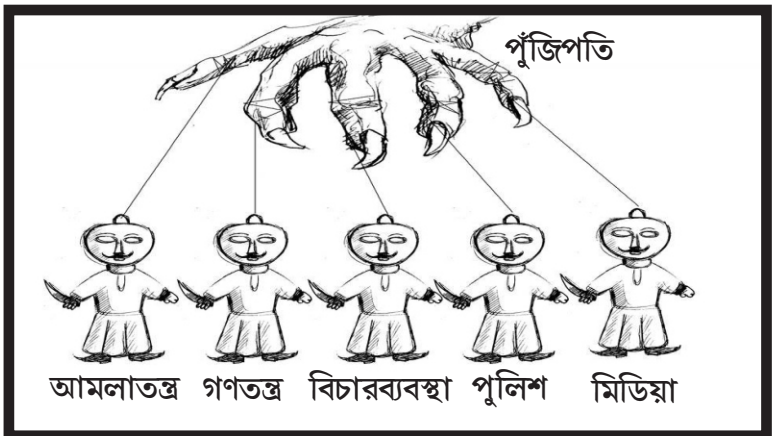

ভোটদান বনাম সংসদীয় গণতন্ত্র

২ এর পাতা

ভোট মানে মতামত দেওয়া, সে যেকোনো বিষয়েই হতে পারে। কিন্তু বাস্তবে তার অর্থ কেটে ছেঁটে এনে দাঁড় করানো হয়েছে একটা লোককে পাঁচ বছরের জন্যে প্রতিনিধি হিসেবে নির্বাচন করে দেওয়ায়। অবিশ্যি ইতিহাসের দিকে তাকালে দেখব রাজতন্ত্রে বা সামন্তযুগে সেটুকু অধিকারও ছিল না। যেটুকু পাওয়া গেছে তা অনেক লড়াই-আন্দোলন এবং রক্তপাতের পর পাওয়া গেছে। এমনকি সার্বজনীন ভোটাধিকার অর্জিত হয়েছে সেটাও একশো বছর হয়নি। ফলে **মানুষ মতামত দেবে, ভোট দেবে আমরা সর্বতভাবে তার পক্ষে। কিন্তু আমাদের মতামত নিচ্ছেটা কোথায়?** নিলেও এমন একটা জায়গায় নিচ্ছে, যেটা দিয়ে কোনও কাজের কাজ হয় না।

বর্তমানে যে শাসন ব্যবস্থা চলছে সেটা খুব খারাপ, এর চেয়ে আগেকার শাসন পদ্ধতি ভাল ছিল

-—এরকম একটা ধারনাও আছে কারো কারো। আমরা এটা মোটেও ঠিক মনে করি না। সমাজ প্রগতিতে আংশিকভাবে হলেও ভোটাধিকার স্বীকৃত হাওয়াটা নিঃসন্দেহে একটা ধাপ এগোনো। অতীতের শাসন পদ্ধতির থেকে বাকস্বাধীনতা নিশ্চিতভাবে বেড়েছে, কিন্তু যেটুকু পাওয়া গেছে তা নিতান্তই অল্প, সব পেয়ে গেছি ভেবে নিয়ে সংসদীয় গণতন্ত্রের মোহের বন্ধনপাশে আবদ্ধ থাকলে আরও যা যা অধিকার অর্জন করার আছে তার লড়াইটা অসম্ভব হয়ে পড়বে।

কিন্তু ভালো লোকেরা ওপরে গেলে, মন্ত্রী-জজ কিংবা আই.পি.এস হলে কি কিছুই ভালো হবে না দেশটার?

ভালো মানে কার ভালো বলতো? তোমার দেশের বেশিরভাগ লোকের তো নুন আনতে পান্তা ফুরোয়। পুলিশ-প্রশাসন-মন্ত্রী-আমলা আর রাজনৈতিক নেতা মিলে গোটা চক্করটা পাবলিকের সেবা করার নামে আসলে পাবলিকের মাথার ওপর চেপে বসে আছে। এই চক্করটায় ঢুকতে পায় কারা? পয়সাওলা ঘরের ছেলেপিলেরাই। আর এই গোটা চক্করটা, যারা সমাজের সেবা বা সমাজ পরিচালনার কাজ করে, এদের মাইনে আর সুযোগ-সুবিধে তোমার-আমার চেয়ে এতটাই বেশি যে ঐ গদিতে বসে চাষাভুষোর আশা-আকাঙ্ক্ষাকে বোঝাই সম্ভব নয়, আর এঁরা নাকি প্রতিনিধি হবেন তাদের। এরা কাজে ঢোকেই জনগণের থেকে বিছিন্ন হয়ে, আর এভাবে এদের বিচ্ছিন্নতা ক্রমশ বাড়ে সাধারণ লোকদের থেকে। তারপর এরা নিজেরা যেমন থাকে আর যেমন লোকদের সাথে মেশে সারাদিন, অর্থাৎ কিনা বড়লোকদের চাহিদা আর আশা-আকাঙ্ক্ষার মতো করে দেশটা চালায়। আর ঠিক এটাই এদের থেকে চাওয়া হয়।

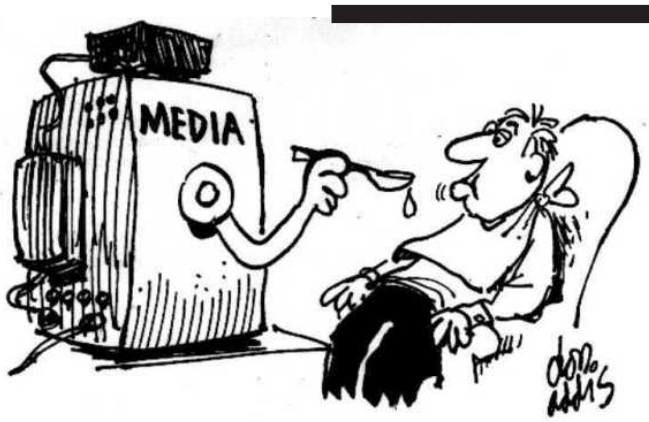

যাকে প্রতিনিধি আকারে ভোট দিয়ে পাঠালাম সে কি আদৌ আমাদের প্রতিনিধিত্ব করে?

বাজার চলতি দলগুলোর প্রতীক চিহ্নে দাঁড়িয়ে যারা ভোটে জেতে তারা জনগণের প্রয়োজন, দাবি ইত্যাদির বদলে দল গুলোর আশা-আকাঙ্খারই প্রতিনিধিত্ব করতে বাধ্য থাকে। আবার দলগুলোর চলার যে খরচ, বিশেষতঃ ভোটের সময়ের বিপুল খরচের বিন্দুমাত্র টাকাও কৌটো নেড়ে ওঠে না (ওটা তোমার টাকায় দল চলে-এমনটা দেখানোর জন্য অভিনয় মাত্র) বরং সিংহভাগটাই যোগায় সমাজের পয়সাওয়ালা শ্রেণীর (টাটা, বিড়লা, আম্বানি থেকে শুরু করে সুদিপ্ত সেন, গৌতম কুন্ডু মায় এলাকার রেশন ডিলার, ঠিকাদার, প্রোমোটার) মানুষ। আর পয়সাওয়ালা শ্রেণীর মানুষের পয়সার পাহাড় গড়ে ওঠে সাধারণ মানুষের ওপর শোষণ চালিয়ে। ফলে এই দু পক্ষের স্বার্থ পরস্পরের বিরোধী হয়। সবসময়ই যাদের টাকায় দল চলে তাদের স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব করার দায় তৈরি হয় সংসদীয় দলগুলোর; ফলতঃ স্বাভাবিকভাবেই সাধারণ মানুষের ভোটে জিতে দলীয় প্রার্থীদের সাধারণ মানুষেরই স্বার্থের বিপক্ষে দাঁড়িয়ে যাওয়া ছাড়া আর কোনও উপায় থাকে না।

তাহলে কি নির্দল প্রার্থীদের জেতালে কিছু লাভ হবে?

নির্দল বলে সমসত্ব কিছু নেই। বহুক্ষেত্রেই রংবেরঙের নানান দলীয় কর্মী দলের প্রতীকের বদলে নির্দল হিসেবে দাঁড়ালে বেশি ভোট পাবে বুঝলে নির্দল দাঁড়িয়ে যায়, কিংবা বিভিন্ন দলের অঘোষিত জোটের প্রার্থী হিসেবে নির্দল দাঁড়িয়ে যায়—যা আমাদের এই পৌরভোটেও দেখতে পাচ্ছি। এদের টিকি বাঁধা থাকে কোনও না কোনও দলের সাথে বা একাধিক দলের কমন স্বার্থের কাছে। কোনও দুর্নীতিগ্রস্ত অথচ পপুলার লোক, যার দুর্নাম পার্টি গায়ে মাখবে না বলে নির্দল দাঁড় করিয়ে পেছন থেকে দলীয় সমর্থন যোগায়। অনেক ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত দলের কোনও বিক্ষুব্ধ কর্মী দলীয় টিকিট না পেয়ে নির্দল হিসেবে দাঁড়ায়, তাদেরও ভাবনাচিন্তা আর কর্মপদ্ধতি দলীয় স্বার্থের চেয়ে আলাদা কিছু হয় না।

বরং কিছু ক্ষেত্রে কোনও গণআন্দোলনের কর্মী যদি কোনও এলাকায় নির্দল হিসেবে দাঁড়ায় সেই আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার বার্তা নিয়ে তাহলে তাকে ভোট দেওয়াটা অনেক যুক্তিসঙ্গত। বিশেষ কাজ করতে না পারলেও সে অন্তত আংশিক হলেও মানুষের লড়াইয়ের আকাঙ্খার প্রতিনিধিত্ব করে।

ভোট নিয়ে কিছু ভ্রান্ত মিথ

আমার নাম ভাঙিয়ে এসব কেন?

সাধারণ মানুষ এত কিছু বোঝে না; অতোটা সচেতন নয়; তারা আর কিই বা করতে পারে? শুধু ভোট-টাই দিতে পারে।

সাধারণ মানুষকে বোকা ভাবাটা একটা নোংরা রাজনৈতিক সংস্কৃতি। দক্ষিণপন্থীরা তো বটেই সংসদীয় রাজনীতির নেশায় আকণ্ঠ ডুবে থাকা বামপন্থীরাও এমনটাই মনে করে। অথচ সাধারণ মানুষ তার প্রাত্যহিক অভিজ্ঞতা থেকে বহুদূর বুঝতে পারে, হয়তো সেঅভিজ্ঞতাগুলোকে একজায়গায় করে সম্মিলিতভাবে একটা তত্ত্বে পৌছতে পারে না। রাজনৈতিক দলগুলো সেই তত্ত্বকে বাইরে থেকে নিয়ে গিয়ে ঐ না পারাটুকুকে ভরাট করতে পারত। তা না করে ঐ দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে মানুষকে বোকা সাজাচ্ছে আর বোকা বানাচ্ছে। যেখানে মার্ক্সবাদী তত্ত্বে বলা হচ্ছে সাধারণ মেহনতি মানুষ গোটা সমাজটাকে বদলে দিতে পারে সেখানে 'মার্ক্সবাদী'রা যদি মনে করে সাধারণ মানুষ ভোট দেওয়া ছাড়া আর কি করতে পারে - তাহলে বলতে হয় তারা অন্ততঃ আর যাই হোক মার্ক্সবাদে আস্থা রাখেন না।

সমাজের ঐ পরিবর্তন তো আর এক্ষুনি হচ্ছে না! আপাততঃ চলার জন্যে এর মধ্যে যতটা ভাল করে চালান যায় তারই তো চেষ্টা করা উচিত।

পরিবর্তন যখন হয় রাতারাতিই হয় বটে, কিন্তু তার জন্যে দীর্ঘদিনের প্রস্তুতি লাগে। কোনও প্রস্তুতি ছাড়া কোনও কল্কি আবতার(!) এসে পালটে দিতে পারে না। আর চলমানতাকে (বলা ভাল চলমান স্থবিরতাকে) চ্যালেঞ্জ না করলে সেই প্রস্তুতি নেওয়াও সম্ভব নয়। ফলে আজ পরিবর্তনটা না হলেও প্রশ্নহীন আনুগত্য কিন্তু কাঙ্খিত নয়, আজকের জন্যও কিছু ঐতিহাসিকভাবে নির্ধারিত ভূমিকা আমাদের নেওয়ার আছে।

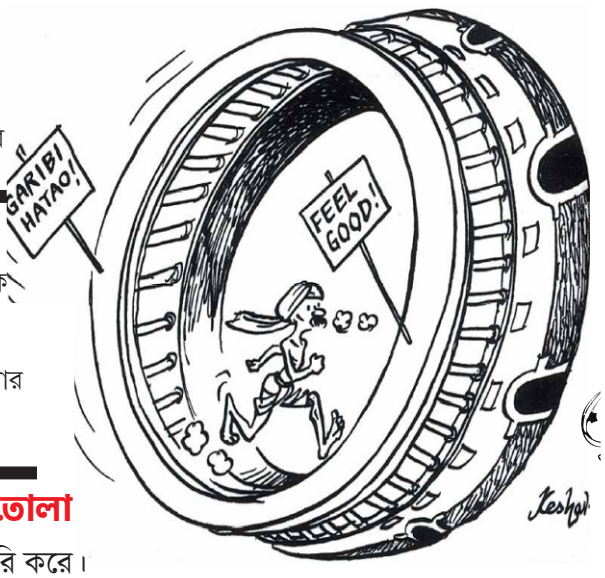

বারবার পরিবর্তন গণতন্ত্রের পক্ষে ভাল।

এই ব্যবস্থায় মানুষের আশা-আকাঙ্খা পূরণ হওয়া সম্ভব নয়—এই সত্যকে চাপা দেওয়ার জন্য দেখানো হয় দলটা ৫ বছর ক্ষমতায় থেকে পারেনি, এবার দলকে সুযোগ দাও। লোকে ভাবল খুব গণতন্ত্র প্রয়োগ করলাম। এভাবে আমাকে আপনাকে একটা গোলক ধাঁধায় ছেড়ে দেওয়া হয়। বারবার পরিবর্তন সংসদীয় গণতন্ত্র টিকে থাকার পক্ষে ভাল এবং মানুষের মাথায় টুপি পরানোর জন্য ভাল বই কি! 'গণতন্ত্রের' পক্ষে ভালো নয়।

শত্রুর শত্রু আমার বন্ধু বা কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলা

এরকম একটা ধারনা নিয়ে রাজনৈতিক দলগুলো জোট তৈরি করে। এটা একটা ভ্রান্ত এবং আদর্শ বিবর্জিত রাজনীতি। আমার-আপনার মত সাধারণ মানুষও এর আবর্তে পাক খাই। এ চিন্তা থেকে বেরোনো উচিত। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে শত্রুর শত্রু আর বড় শত্রু। বন্ধুর বন্ধুকে বরং খোঁজার চেষ্টা করুন।

পৌর নির্বাচন আর লোকসভা-বিধানসভা নির্বাচন তো এক নয়।

একদম তাই। পৌরসভা, পঞ্চায়েত, সমবায়, কর্মক্ষেত্রের ইউনিয়ন গোছের সংস্থাগুলো কিন্তু সে অর্থে সংসদীয় কাঠামোর মতো নয়। দল বা রাষ্ট্রের প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপের বদলে এগুলোতে মানুষের বেশি অংশগ্রহণ সম্ভব, তুলনায় অনেক কাছের এবং কম পরিধির গণতন্ত্র। এই সংস্থাগুলোর কোনও বড় পলিসি নেওয়ার এক্তিয়ার নেই---পলিসি বাস্তবায়ন করা এবং অধিকার আদায়ের মঞ্চ হয়ে ওঠার কথা। ভোটাররা নাগরিক পরিষেবার নিরিখেই পৌর নির্বাচনকে আলাদা করে দেখে। রাস্তাটা হবে, আলোটা আসবে, জলের ব্যবস্থাটা হবে, নর্দমাটা পরিষ্কার হবে এই সব। পরিচিত মুখের, ঘরের ছেলের, যখন চাই তখন পাই গোছের খাটিয়ে কর্মীর কদর খানিক বেশি।

আবার কিছু অর্থে সংসদীয় নির্বাচনের সাথে যোগও আছে। প্রথমতঃ কোন দল রাজ্যে ক্ষমতায় আছে তার সাথে সংযুক্ত হয়ে পড়ে পৌরভোট। দ্বিতীয়তঃ ভোট সর্বস্ব দলগুলো পৌরভোটে জিতে সংসদীয় ঢং-এ পৌরসভাকে পরিচালনা করে। তৃতীয়তঃ সে অর্থে এখানে কিছু কাজ করার সুযোগ থাকলেও তাতে প্রবল গাফিলতি, দুর্নীতি চলতে থাকে। চতুর্থতঃ পৌরভোটের কুমিরছানা দেখিয়ে লোকসভা-বিধানসভার ভোটে ফায়দা তোলা হয়। ফলে সাধারণ মানুষকে টুপি পরানোর প্রশ্নে এই দুই ধরনের নির্বাচন মিলে মিশে একাকার হয়ে যায়।

প্রত্যেক মহিলা প্রতিনিধি পিছু একজন পুরুষ স্যাঙাৎ।

আমাদের পিতৃতান্ত্রিক এই সমাজ একসময়ে মেয়েদের ভোটাধিকার দিতে নারাজ ছিল। নির্বাচন করার এবং নিজে নির্বাচিত হওয়ার অধিকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার এতো বছর পরেও 'মেয়েরা সব কাজ পারে না' গোছের একটা ভুল ধারণা মনের খুব গভীরে শিকড় গেড়ে বসে আছে। কানের ধারে এই এক কথা বারবার বলে বলে মেয়েদের আত্মবিশ্বাসকে খর্বিত করা হয়। নির্বাচনে মেয়েদের সিট সংরক্ষিত না থাকলে তাদের অংশগ্রহন যে প্রায় অসম্ভব ছিল তা বলাই বাহুল্য। আর নির্বাচিত মহিলা প্রতিনিধিদের বেশিরভাগ ক্ষেত্রে নির্ভর করতে বাধ্য করা হয় দলের পুরুষ নেতা কিংবা স্বামীর (পরিবারের পুরুষ অবিভাবক) ওপর। সংরক্ষিত সিট-এ বাড়ির 'বউ'কে দাঁড় করিয়ে বকলমে পুরুষরাই সব করতে থাকে। কাগজে সই করা ছাড়া মেয়েটির ভূমিকা হয়ে ওঠে কার্যত শূন্য। দলগুলোও চেষ্টা করে না তাদের অংশগ্রহণ কীভাবে বাড়ানো যায়—অন্ধকারেই রেখে দেয়। তাদের কাজ করতে বা সিদ্ধান্ত নিতে দেওয়া হয় না। মেয়েদের ক্ষমতায়ণের প্রশ্নটা বিরাট প্রশ্ন চিহ্নের মুখে দাঁড়ায়।

আবার যে গুটিকয়জন, মেয়ে হিসেবে প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণও করছে, খাটছে (উদাহারন-মমতা, মায়াবতী, জয়ললিতা থেকে শুরু করে গ্রামে গঞ্জের প্রচুর মহিলা দলীয় কর্মী) সেক্ষেত্রেও তাদের মেয়ে হিসেবে কটাক্ষ করা হয়, তাদের ব্যর্থতাকে অনেকেই 'মেয়ে বলেই ব্যর্থ' এমনভাবে ব্যাখ্যা করে। আবার ক্ষমতার অলিন্দে থাকা মেয়েরাও সমাজ নির্মিত 'পুরুষ'-এর মতই আচরণ করে। আপামর মেয়েদের ক্ষমতায়নের প্রশ্নটা এখানেও উত্তরহীন।

মেয়েদের অংশগ্রহণ বাড়ানোর দাবি তুলতে হবে। কটাক্ষ নয়, মেয়েদের স্বাধীনভাবে কাজ করতে উৎসাহ দিতে হবে, অনভ্যাসের কারণে প্রথমে প্রথমে ভুলত্রুটি হলে হোক। সমাজের অর্ধেক জনসংখ্যার অগ্রগতির স্বার্থে এটা দরকার।

বাবা বড্ডো কঠিন কথা, মাথার ওপর দিয়ে উড়ে যাচ্ছে

কাজটা কঠিন আর কথাগুলো কঠিন হবে না? না হয় একটু কঠিন কথা পড়া অভ্যাস করি এবার। 'লোকে বুঝবে না'-র দোহাই দিয়ে কথাগুলো চেপে যাওয়ার কোন মানে হয় না।

তৃতীয় লিঙ্গের মানুষদের জন্য ভোটে দাঁড়ানোর ক্ষেত্রে বিশেষ সংরক্ষণ এবং স্বাধীনভাবে অংশগ্রহণের ব্যাপারে সজাগ হওয়া জরুরি।

কাজের মানুষ বনাম পাইয়ে দেওয়ার রাজনীতি

সে অর্থে একজন জনপ্রতিনিধি তার নির্বাচনী এলাকায় যে তাকে ভোট দেয়নি তারও প্রতিনিধি। ফলে নাগরিক পরিষেবার ক্ষেত্রে কারো ব্যাপারে পক্ষপাতমূলক আচরণ করার কথা নয়। অথচ বর্তমানের ভোট সর্বস্ব রাজনীতিতে সারাক্ষণ হিসেব-নিকেশ চলে তা নিয়ে— ওপাড়ায় কটা ভোট আছে তার ওপর নির্ভর করে ইলেকট্রিকের পোষ্ট পোঁতা হবে কিনা; এ পাড়ায় দুটো বেশি জলের কল লাগিয়ে দিলাম; চাকরীর দুটো ফাঁকা পোস্ট-এ দলের দুটো ছেলে ঢুকিয়ে দিলাম; কারো বাড়ি, দোকান বা নার্সিংহোমের বেআইনি প্ল্যান পাস করিয়ে দিলাম— এ উদাহরণের কোনও শেষ নেই। ফলে আপাত দৃষ্টির একজন কাজের লোক 'পাইয়ে দেওয়ার রাজনীতি'র চক্রটা ক্রমাগত বাড়িয়েই চলে। নাগরিক পরিষেবাগুলো 'পাইয়ে দেওয়ার'ই কথা ছিল—কিন্তু সেটা সক্কলকে। কিন্তু যখন সরকারগুলোর নীতিই হচ্ছে নাগরিক পরিষেবার খাতে টাকা কমানো, ভর্তুকি তুলে দেওয়া তখন সকলকে সব দিতে না পারাটা অতীত দিনের থেকে বাড়তে থাকছে। ফলে সহজ পন্থাটা হল 'কিছু লোক'কে পাইয়ে দাও। তোমার হকের জিনিস, যেটা এমনিই পাওয়ার কথা ছিল সেটা ক'রে দিয়ে দেখান হল 'আমি ক'রে দিলাম', 'তোমাকে পাইয়ে দিলাম'— বিনিময়ে ভোট দাও— এভাবে এখানে একটা সুযোগ-সুবিধে আর ভোটের মধ্যে দেনাপাওনার সম্পর্ক তৈরি হয়। বহু মানুষ এটাকেই ভোটের পদ্ধতি হিসেবে বিশ্বাস করে—'ও আমার এ কাজটা করে দিয়েছে, ওকে ভোট না দিয়ে পারি!' 'আমার অসুস্থতার সময়তো ও ই পাশে ছিল। সেটা কি ভুলতে পারি?' ফলে মানুষ ভোট দিয়ে সে প্রতিদান মেটায়। কোথাও কোথাও তো প্রত্যক্ষভাবে টাকার বিনিময়ে ভোট কেনাবেচা চলে। আমরা পরিষ্কার মনে করি **'এগুলো মানুষ হিসেবে প্রতিনিয়ত অপমানিত হয়ে চলা। নিজের চেতনার অপমান, নিজের অস্তিত্বের অপমান'**। সর্বোপরি গণতন্ত্রের যে প্রাথমিক ধারণা তার বিপরীত।

"প্রসঙ্গত উল্লেখ্য আমাদের দেশে নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি না মানলে তার বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নেওয়ার মতো কোনও আইন নেই।"

সত্যি বলতে এই গোটাটা চলছে বর্তমান অর্থনৈতিক কাঠামোটাকে টিকিয়ে রাখার জন্য। ফলে যতক্ষণ না গোটা কাঠামোটা বদলে ফেলা হচ্ছে এ সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়। অথচ অনেককিছু করার ছিল—এই সত্যটাই জনসমক্ষে তুলে ধরা উচিত ছিল। তা না করে কী কী করেছি তার খতিয়ান ছাপা হয়, আর ভোটের আগে প্রতিশ্রুতির বন্যা বইয়ে দেওয়া হয়।

সবাইকে সব বিষয়ে মতামত দেওয়ানো সম্ভব নয়।

এটা একটা বদ্ধমূল ধারণা, অথচ পরক্ষনেই বলা হয় আমাদের মতামতেই নাকি দেশ চলে—দেখুন কি রকম পরস্পর বিরোধী কথাবার্তা। **ওয়ার্ড কমিটি, গ্রাম সভা বানালেও সেখানে তো সবাই আসে না, মতামত দেয় না।** —কেনই দেবে? সে তো জানে তার মতামতের কোনও গুরুত্ব নেই। পয়সাওয়ালা লোকটা বা শিক্ষিত ছেলেটা বাড়ির পুরুষ মানুষটার কথার গুরুত্ব সেখানে বেশি দেওয়া হয়। মতামত নেওয়ার ব্যাপারে যে যত কম গুরুত্ব পায় সে মতামত দিতে কম উৎসাহ বোধ করে।

রাষ্ট্র আড়ালে দাঁড়িয়ে মাপে

অথচ উল্টোদিকে, এই পরিস্থিতিতেও একটা বড় অংশের সাধারণ মানুষ প্রতিনিয়ত সামাজিক ক্ষেত্রে মতামত দিচ্ছে, এমনকি মতামত তৈরিও হচ্ছে। জনগণের তাতে একটা সম্মিলিত সেন্টিমেন্টও তৈরি হয়। **রাষ্ট্র আড়ালে দাঁড়িয়ে মাপে;** ক্ষোভ জমা হচ্ছে দেখলে দুটো রুটি ছুঁড়ে দেয়, নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেলে বেমক্কা মারধোর। কিন্তু সামনা-সামনি কোনও বিষয়ের ওপর মতামত (ভোট) নিতে আসে না।

আমরা মানে, স্কুল কলেজে পড়া ফচকে ছেলেমেয়েরা একবার গেছোবৌদিকে জিগ্যেস করে ছিলাম যে— দেশের অধিকাংশ মানুষ সতস্ফুর্তভাবে ভোট দেয়, বিপাশা বসু, সচিন তেন্ডুলকার থেকে অনিল আম্বানী সবাই ভোট দেন, দিতে বলেন—এরা কি সবাই ভুল কাজ করেন ?

গেছোবৌদি বললেন—

শোন্, বেশিরভাগ লোক করলেই কোনো একটা কাজ ঠিক হয়ে যায় না। একসময় বেশিরভাগ লোক মনে করতো স্বামী মরে গেলে বুকে সতী হয়ে চিতায় পুড়ে মরতে হবে, ওতেই নাকি ভালো হয়। তোদের বিজ্ঞান বইয়ের ঐ গ্যালিলিও না কে একটা, তাকে তো বেশিরভাগ লোক পাগল বলে ভাবতো একসময়।

দ্যাখ, বিপাশা বসু কেন ভোট দেয় তাই নিয়ে বলতে গেলে বলবো— কোনো মানুষ কোনো একটা বিশেষ বিষয়ে দক্ষ হলেই তার অন্য কোনো বিষয়ে স্বতস্ফূর্ত: দক্ষতা জন্মায় না। ফলে কুমারশানু রিলেটিভিটি বিষয়ে কি ভাবছেন কিংবা প্রীতি জিনটার বোরো চাষ বিষয়ে কি বলছেন সেটা যেমন আমরা ততটা গুরুত্ব দিয়ে শুনিনা, ঠিক তেমনি ভোট দিয়ে দেশ তথা সমাজের কি উন্নতি হবে আর কি হবে না— সে বিষয়ে বিপাশা বসু কিংবা সচিন তেন্ডুলকার মনোভাবকে ততটা গুরুত্ব দেওয়ার দরকার নেই।

দেশের আর পাঁচটা লোক ভোট নিয়ে যেমন করে ভাবে এরাও তেমন করেই ভাবে, আর তাছাড়া টিভিতে এদের বলার ব্যাপারটা তো বিজ্ঞাপনগুলো দেখলেই পরিষ্কার হয়। শাহরুখ খান তো টিভির বিজ্ঞাপনে তাঁর সমস্ত কৃতিত্বটুকু তুলে দিতে চায় "সোনা চাঁদি চ্যবনপ্রাশ"-এর হাতে, কিংবা সচিন তো বলে "বুস্ট ইস দি সিক্রেট অফ মাই এনার্জি"— তখন আমরা সেটাকে যতটা বিশ্বাস করি, এমনকী তারা নিজেরাও যতটা বিশ্বাস করে, ভোটের দিন তারকাদের কথাবার্তায় তার চেয়ে বেশি বিশ্বাস এর দাবি রাখেনা।

বরং বলতে পারিস অনিল আম্বানীকে বা অনিল আম্বানীদের নিয়ে! আরেবাবা, ওদেরই তো লাভ এসব ভোটের গল্পে। ওদের শুধু দরকার দেশের লোক ঝামেলা না করে ওদের শান্তিতে ব্যবসাপত্র করতে দিক, যে সরকারই আসুক ওদের টাকা বাড়বেই, ওরাই তো বলবে ভোট নিয়ে ভুলে থাকতে। আর এই দ্যাখ; তোদের গেছোদাদার মতো লোকরা— বছর বছর নাচবে ভোট নিয়ে, আঙ্গুলে নীল কালি লাগিয়ে ঘুরবে দুদিন, ব্যাস তারপর আবার সারাবছর খেটে মরেও ঘরের টালির চালটুকু পাকা করতে পারবে না!

যা যা নিয়ে আমরা ভোট দিতে চাই

ভারত নাকি পৃথিবীর 'বৃহত্তম গণতন্ত্র', আর ভোট দেওয়া নাকি আমাদের সর্বোচ্চ নাগরিক কর্তব্য। তাহলে বলতে হয়— সমস্যা, **গণতন্ত্র = ভোট,** এই সরল সমীকরণে।

'বৃহত্তম গণতন্ত্রে' মানুষের সমস্ত অধিকার এসে ঠেকেছে পাঁচ বছর অন্তর একটা ভোট দেওয়ায়। যে ভোট দিয়ে নির্বাচিত করে সরকারে পাঠানো যায় কিছু সন্দেহজনক বজ্জাত আর কিছু সন্দেহাতীত বজ্জাতদের মধ্যে কাউকে। যদিও এই লোকেদের দিয়ে আবার দুনিয়াটা চলে না। বহুবার ব্যবহার করে গণতন্ত্র আর পাঁচ বছরে একবার ভোট শব্দদুটোকে সমার্থক করে তোলা হয়েছে। প্রশ্নটা যদি দেশ বা রাজ্য বিষয়ক গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে মতামত দেওয়ার কথা হয় তবে তো জনগণ ভোট (মতামত) দিতেই চায় আরও বহু বিষয়ে— কই এসব নিয়ে তো কারও মতামত নেওয়া হয় না।

যা যা নিয়ে আমরা ভোট দিতে চাই—

এক: সুইস ব্যাঙ্কে ভারতের নানা কোটিপতিদের যে বিপুল পরিমাণ কালো টাকা রাখা আছে, যে টাকায় দেশের গাদা-গাদা লোকের খাদ্য-বস্ত্র-বাসস্থান-স্কুল-হাসপাতাল এর বন্দোবস্তো করা যেত, সেই সব টাকাকে দেশে ফেরত আনা হবে কিনা?

দুই: মুকেশ আম্বানীকে এত কোটি টাকা ছাড় দেওয়া হল ট্যাক্সে, তার জন্য সংশোধন করা হলো ট্যাক্স আইন। মুকেশ আম্বানীকে আরো বেশি টাকার পাহাড় জমাতে দিতে চাই কি আমরা? কই দেশের লোকের মতামত তো নেওয়া হল না মুকেশ আম্বানীকে ট্যাক্স ছাড় দেওয়া হবে কিনা সে ব্যাপারে।

তিন: শিক্ষা আর স্বাস্থ্য নিয়ে দেশে কি নীতি দেশে নেওয়া হবে, আরো আরো এরকম প্রাইভেট স্কুল-কলেজ খোলা হবে কিনা যাদের ফি প্রচুর, সরকারী হাসপাতাল বেচে দেওয়া হবে কিনা এসব নিয়ে চাই আমরা ভোট দিতে, আমাদের মতামত নিয়েই তো বেচে দেওয়া হচ্ছে শিক্ষা আর স্বাস্থ্য-এর ক্ষেত্রগুলো।

চার: সিঙ্গুর-এর কৃষকদের ভোট দিয়ে ঠিক করা হল নাতো সিঙ্গুরের জমি নেওয়া হবে কিনা। আয়লার পর সুন্দরবনের বাঁধ কেমন হবে— মাটির না কংক্রিটের—এর ওপর নির্ভর করবে সুন্দরবনবাসীর বাঁচা-মরা, তার জীবন-জীবিকা-ভবিষ্যত— কই এই সিধান্তটা সুন্দরবনবাসীর ভোট দিয়ে ঠিক হলো নাতো? আমরা তো দিতেই চাই এই ভোটগুলো।

পাঁচ: দেশের এম.এল.এ- এম.পি দের মাইনে আর সুযোগ-সুবিধে কত হবে কেন ভোট দিয়ে ঠিক হয় না?

আমাদের রোজকার বাঁচামরা সংক্রান্ত এসব কোনো প্রশ্নই যদি ভোট দিয়ে ঠিক না হয় তবে পাঁচ বছর অন্তর কি ভোট দিয়ে শুধু আস্থাজ্ঞাপন করবো যে আমরা যা চলছে সেটার সঙ্গে আছি?

আমাদের আলোচনা শুনে ক্রিটিক্যাল জ্যেট্ট প্রশ্ন করলেন আমাদের — তাহলে ভোটের দিন কী করতে বলছ তোমরা?

অমনি আমাদের ফাজিল দাস বলতে শুরু করল

এমনভাবে বলছেন যেন আমরা যা বলব সেইটা করবেন বলে রেডি হয়ে আছেন। জানি তো মাথাছেন, 'ভোট দেবেন না' বললেই ঘাপ করে একটা **'মাওবাদী' বা 'নকশাল' স্ট্যাম্প লাগিয়ে দেবেন।**

দেখুন, সংসদীয় নির্বাচনে কোনও দলের নীতি থাকে 'ভারতকে নির্মাণ করব', কোনও দলের 'অঙ্গরাজ্যে সরকার গড়ে জনগণকে আশু রিলিফ দেব', কেউ বা ভাবে 'ভেতরে না গেলে ভেতরে কি চলে মানুষকে জানাব কি করে'- ইত্যাদি। কিন্তু ভেতরে গিয়ে সেসব আর করে না। পাঁচ বছর পরে নিজে কী কী করেছি তার খতিয়ান দিয়ে আবার জিততে চায়। আমাদের নীতি হল ভোটের সময় রাষ্ট্রের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানগুলোর, বিশেষ করে গণতান্ত্রিক কাঠামোর স্বরূপ উন্মোচন করা, অর্থাৎ সংসদীয় গণতন্ত্রের প্রতি আমাদের যে মোহ তা থেকে মুক্তির চেষ্টা করা। তার জন্যে কাকে ভোট দেবেন কিংবা নোটাতে ভোট দিতে বলা এমনকি নিজেরাই ভোটে দাঁড়িয়ে যাওয়া আমাদের কাছে সমার্থক। তবে ভোট-এ দাঁড়ালে আমরা আজ যা যা বলছি সেই কথাগুলো বলেই ভোট দিতে বলব, কোনও প্রতিশ্রুতির ওপর নয়।

মনে রাখবেন, সার্বজনীন ভোটাধিকার ঐতিহাসিকভাবে সমাজে প্রগতিশীল দাবি হিসেবে অনেক লড়াইয়ের মাধ্যমে অর্জিত হয়েছে। এখন ইতিহাস দাবি করছে পরের পদক্ষেপটা ফেলব নাকি এখানেই আটকে থাকব?

কিন্তু যারা যারা এক্ষুনি মনে করছে এ সরকারের বদলে ও সরকার, অমুক লোকের বদলে তমুক লোক ভোটে জিতলে ভাল হবে-- তাদের বলছি--চলুন, আমরা বরং **একবার ভোট দিয়ে পাঁচ বছর হাত গুটিয়ে বসে না থেকে অন্ততঃ আর একটু সক্রিয় হই।** নজরদারি চালাই প্রতিনিধিদের ওপর। কেবল নিজেরটুকু করিয়ে নেওয়ার বদলে নিয়ন্ত্রণ বাড়ানোর চেষ্টা করি প্রতিনিধিদের ওপর। সভা ডেকে নিয়মিত জবাবদিহি করতে বাধ্য করি, আমাদের ট্যাক্স-এর টাকা কীভাবে খরচ হচ্ছে তার রিপোর্ট আমাদের জানাতে বাধ্য করি। **বহুদুর যাত্রার এটা অন্ততঃ একটা পদক্ষেপ হবে।**

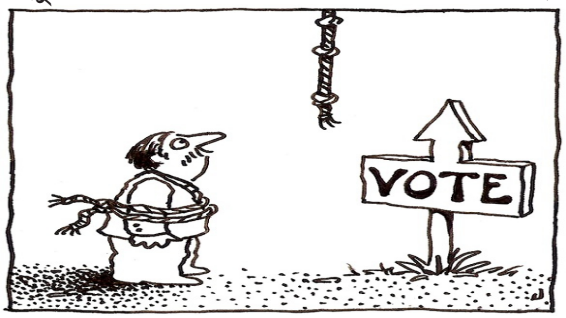

সাধারণ মানুষের মধ্যে এই সচেতনতা প্রসারের কাজ কি সত্যিই মিডিয়া রাষ্ট্র বা প্রতিষ্ঠিত দলগুলো করতে পারে?

রাষ্ট্র চায় প্রশ্নহীন আনুগত্য। যেখানে এই রাষ্ট্র কাজ করে পুঁজির চলাচল কীভাবে বাড়বে, বাজার কীভাবে সম্প্রসারিত হবে এবং সম্পদ মুষ্টিমেয় কিছু মানুষের হাতে আরও বেশি করে কুক্ষিগত হবে সেই স্বার্থে, তখন স্বাভাবিকভাবেই টাটা-আম্বানি-আদানি এবং রাষ্ট্র চাইবে না মানুষ সচেতন হোক, কারণ **যুগের পর যুগ সচেতন মানুষই রাষ্ট্রকাঠামোকে চ্যালেঞ্জ জানিয়েছে।** আর প্রতিষ্ঠিত দলগুলো ক্ষমতায় থাকাকালীন রাষ্ট্রেরই প্রতিভু হয়ে উঠে নিজেরাই দমন চালায়—মানুষ আপাত পাওনাগণ্ডার বাইরে রাষ্ট্রকাঠামো নিয়ে ভাবুক—এটা মোটেও তারা চায় না।

এই গণতন্ত্রে আপনার 'ভোট'টি মূল্যবান, আপনি নয়।

KNS-এর রাজ্য কমিটির পক্ষে অরিজিত কর্তৃক প্রকাশিত